বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

P2A

বিসিএস বাংলা সাহিত্য

প্রথম ভাগঃ প্রাচীন এবং মধ্যযুগ

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৩তম BCS	৪১তম BCS	৪০তম BCS	৩৮তম BCS	৩৭তম BCS	৩৬তম BCS	৩৫তম BCS
০১	**প্রাচীন যুগ**							-
	চর্যাপদ	২	১	২	১	২	-	২
	অন্যান্য সাহিত্য							
০২	**মধ্যযুগ**							
✓	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য				১		১	
✓	মঙ্গলকাব্য	১					১	১
✓	বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী			১	১	২		
✓	জীবনী সাহিত্য		১	১				
✓	লোক সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা			১	১	১		
✓	অনুবাদ সাহিত্য							১
	নাথ ও মর্সিয়া সাহিত্য					১		
	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান							১
	আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য	১			১		১	১
	পাঁচালিগান		১					
	শায়ের, কবিওয়ালা, পুঁথি সাহিত্য						১	
	সর্বমোট প্রশ্ন:	**৪**	**৩**	**৫**	**৫**	**৬**	**৪**	**৬**

P2A

মধ্যযুগ থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন

- ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের রচয়িতা ‘জয়দেব’ কার সভাকবি ছিলেন?- ৪৫ বিসিএস
- কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়? -?- ৪৫ বিসিএস
- নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন-?- ৪৫ বিসিএস
- কোনটি কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ--?- ৪৫ বিসিএস

P2A

মধ্যযুগ থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন

১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল? -৪৪ বিসিএস

২) বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন? -৪৪ বিসিএস

৩) 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' -এই মনোবাঞ্ছাটি কার? -৪৪ বিসিএস

৪) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের উপাস্য চন্ডী কার স্ত্রী? -৪৪ বিসিএস

P2A

মধ্যযুগ থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন

১) মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কি ?-৪৩ বিসিএস

২) দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? -৪৩ বিসিএস

১) মহাকবি আলাওল রচিত রচনা কোনটি? -৪২ বিসিএস

১) জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠে কাকে কেন্দ্র করে? -৪১ বিসিএস

P2A

মধ্যযুগ থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন

১) উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়? -৪০বিসিএস

২) জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত? -৪০ বিসিএস

৩) বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে কোন ভাষা সম্পর্কিত? -৪০ বিসিএস

P2A

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

প্রাচীন যুগ : ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগ: ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

আধুনিক যুগ : ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল।

মধ্যযুগ

১২০১-১৮০০

মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক।

অর্থাৎ ধর্মীয় আবেশে মধ্যযুগে সাহিত্য রচনা হত।

অন্ধকার যুগ (১২০১- ১৩৫০)

১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ- এই ১৫০ বছরকে কেউ কেউ ‘অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করেন। অনুমান করা হয়, তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

অন্ধকার যুগ (১২০১- ১৩৫০)

ড. সুকুমার সেনের মতে, ‘মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয় শুরু' হয়েছিল।

গোপাল হালদারের মতে, তখন ‘বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত প্রেরণা পায়নি।

পন্ডিতেরা এ সময়টি নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন কিন্তু কেউ অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি।

অন্ধকার যুগ নিয়ে বিতর্ক

অন্ধকার যুগের জন্য তুর্কি শাসনকে দায়ী করলেও পরবর্তীতে মুসলিম শাসকগণকে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখা যায়।

সেন শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বিতাড়িত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা বিতাড়িত হলে অবহেলিত বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগ দানের লোকের অভাব হয়ত ছিল।

সম্ভবত তুর্কি বিজয়ের পূর্বে বাংলা লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি। তখনকার শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃতশিক্ষিত। বাংলা তখন ধর্মপ্রচার ও রাজ্যশাসনের বাহন ছিল না। এছাড়াও কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি একথা পুরোপুরি সত্য নয়। এ সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও **অপভ্রংশ, প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ থাকায় অনেকেই অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব মানতে চান না।**

আরও কিছু কারণ

এদেশের মানুষের চিরন্তন জীবনযাপন ব্যবস্থা, এখানকার আবহাওয়া, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে এই সময়ের কোন সাহিত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকা হয়ত সম্ভবপর হয় নি। চর্যাগীতি, সেক শুভোদয়া ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি করে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর এই একটি মাত্র নমুনা যদি না পাওয়া যেত তবে এ সব সাহিত্যও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যেত। তাই মনে করা যায় যে, এ সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকলেও তার অস্তিত্ব হয়ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

ড. আহমদ শরীফ তথাকথিত অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না পাওয়ার কারণগুলো এভাবে একত্রিত করেছেন :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয় নি বলে বাংলা তুর্কি বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি।

খ. তের-চৌদ্দ শতক অবধি বাংলা ভাষা উচ্চবিত্তের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠে নি।

গ. সংস্কৃততর কোন ভাষাতেই রসসাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। তুর্কি বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাংলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেক কাল গড়ে ওঠে নি।

ঘ. তের-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু শাসিত মিথিলায়, তাই এ সময় বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয় নি।

ঙ. আলোচ্য যুগে বাংলায় কিছু পুঁথিপত্র রচিত হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। আগুন-পানিউই-কীট তো রয়েইছে।

চ. লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সেক শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বার শতক হয়, তাহলে তের-চৌদ্দ শতক বাংলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাংলা। বাংলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কিবিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না।

P2A

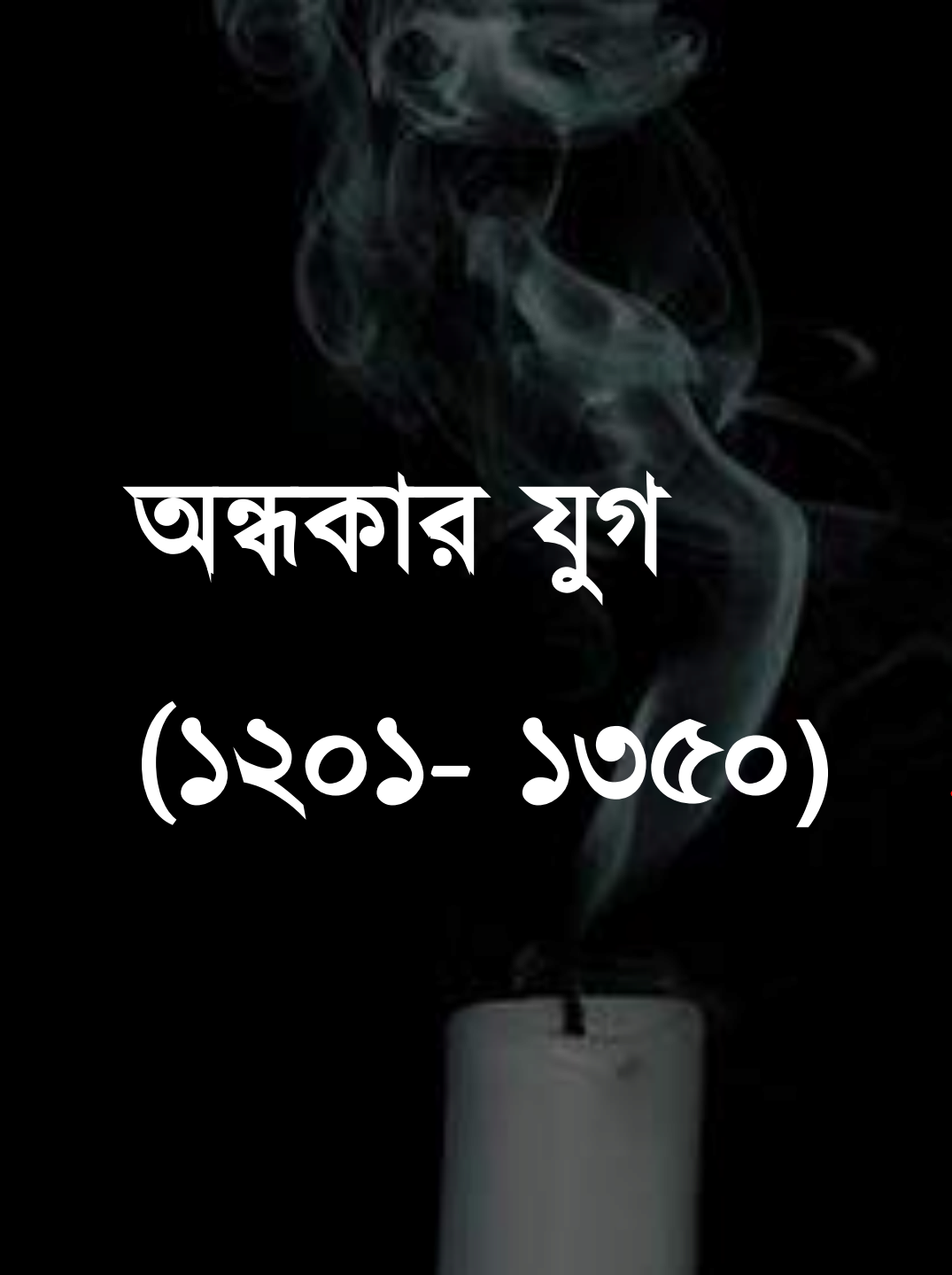

অন্ধকার যুগ

(১২০১- ১৩৫০)

এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন হলো-

- শূন্যপূরাণ
- সেকশুভোদয়া
- খনার বচন
- আর্যা (পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য)
- প্রেমসঙ্গীত
- প্রাকৃতপিঙ্গল (প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতা)

শূন্যপুরাণ

- রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'।
- রামাই পণ্ডিতের কাল তের শতক বলে অনুমিত হয়।
- শূন্যপুরাণ **গদ্য ও পদ্যের** মিশ্রণে রচিত একটি চম্পূকাব্য।
- এতে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। শূন্যপুরাণে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- এ গ্রন্থের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে তা মুসলমান তুর্কি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরের, অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা।'

সেক শুভোদয়া

- রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচিত ‘সেক শুভোদয়া’ সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।
- গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
- 'শেখের শুভোদয়’ অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।
- এতে নানা ঘটনার মাধ্যমে মুসলমান দরবেশের চরিত্র ও অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় দেয়া হয়েছে।
- এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তা হল-
- পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা আর্যা,
- খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেমসঙ্গীত।
- আর্যার সংখ্যা তিনটি এবং এগুলো বাংলা ভাষায়প্রাপ্ত পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।
- ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, ‘সেক শুভোদয়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিককার রচনা।’

P2A

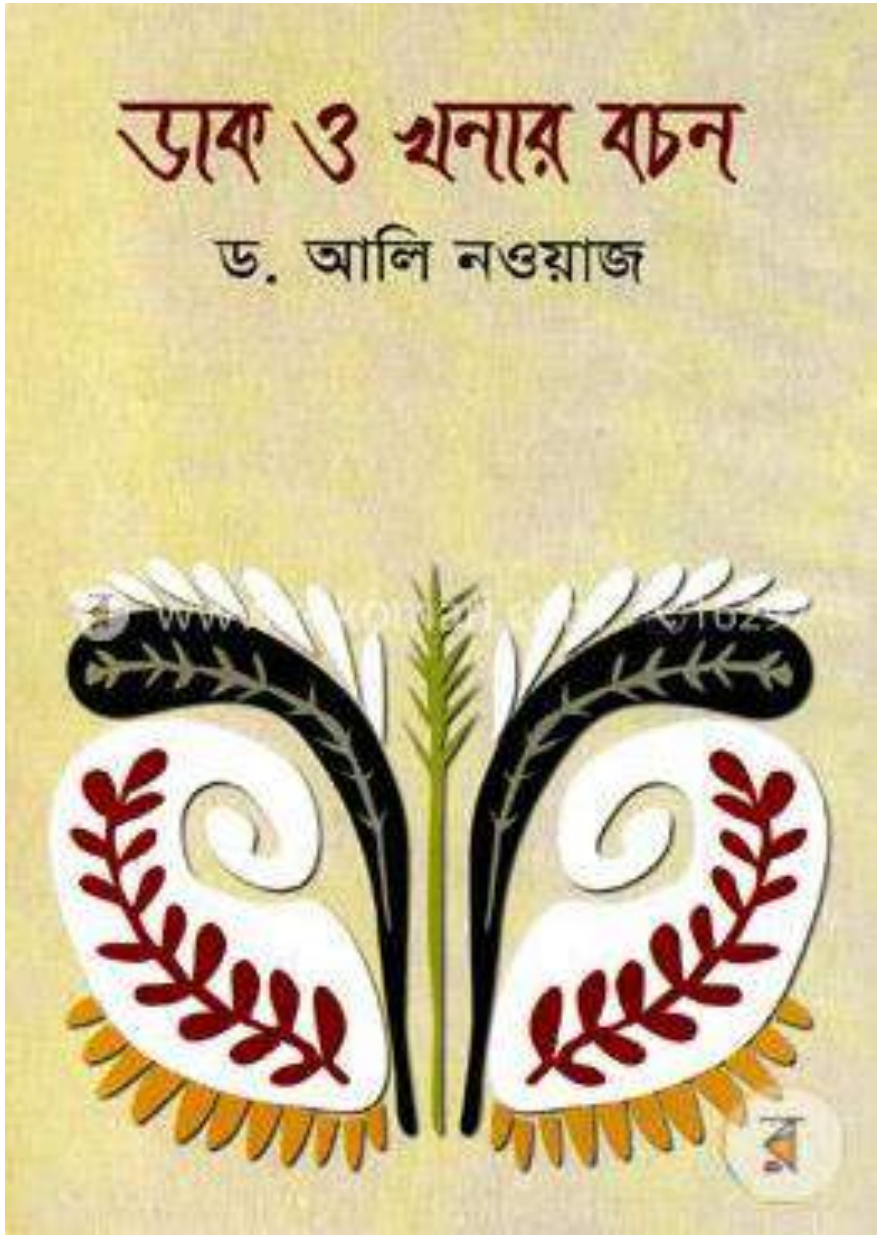

ডাক ও খনার বচন

ডাক ও খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আধুনিক যুগে চলে এসেছে। সেজন্য এর ভাষায় প্রাচীনত্ব অবশিষ্ট নেই।

খনা

- মধ্যযুগের প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে ডাক ও খনার বচন উল্লেখযোগ্য। খনার বচনের রচয়িতা খনা। জনশ্রুতি আছে- লঙ্কাদ্বীপের রাজকুমারী লীলাবতী মতান্তরে রাক্ষসকবলিত কোন এক রাজ্যের অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারীর নাম লীলাবতী যিনি খনা নামে পরিচিত।
- খনা অর্থ বোবা। জিব কর্তনের পর এ নামটি প্রতিষ্ঠা পায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যর নবরত্ন সভার পণ্ডিত বরাহমিহিরের পুত্র মিহির খনার স্বামী। কথিত আছে- জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার ফলে রাজা বিক্রমাদিত্যর সভার দশম পণ্ডিত হিসেবে খনা আসন লাভ করেন। এতে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পণ্ডিত বরাহমিহির পুত্রকে খনার জিব কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। জিব কেটে দেওয়ার আগে তাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন খনা কৃষি, আবহাওয়া-তত্ত্ব সম্পর্কে বহুবিধ কথা বলে যান। পরবর্তীকালে সেসব কথাই ‘খনার বচন' নামে পরিচিত।
- আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে খনা কোনো মহিলার নাম নয়। কৃষক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই খনা নামে প্রচলিত ছিল।

ডাক ও খনার বচন

- ‘ডাক ও খনার বচন’ কে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয় । ‘তিব্বতি’ ভাষায় ডাক ও খনা শব্দদ্বয়ের অর্থ ‘প্রজ্ঞাবান’। শুভাশুভ, নীতি, বিধিবিধান ও উপদেশবাচক প্রাজ্ঞোক্তিই ডাক ও খনার বচনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ‘খনার বচন’ রচয়িতার প্রকৃত নাম ‘লীলাবতী’। খনার বচনে **কৃষি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক** বিচিত্র অভিজ্ঞতা সন্নিবেশিত হয়েছে। ফসল, উদ্ভিদ সংক্রান্ত নানা দিকনির্দেশনা ছাড়াও প্রকৃতি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার নানা উপদেশ এতে রয়েছে।
- **‘ডাক’ ছিলেন প্রাচীন বাংলার একজন বচনকার।** ডাকের বচনে **সাধারণত জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের** ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে খনার বচনে ‘কৃষি ও আবহাওয়া’র কথা প্রধান্য পেয়েছে। এ দুটির কোনো লিখিত নিদর্শন বর্তমানে নেই । মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াজাতীয় এ নমুনাকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

P2A

৩২ বিসিএস প্রশ্ন

শূন্যপুরাণ রচনা করেছেন-

রামাই পণ্ডিত

শ্রীকর নন্দী

বিজয় গুপ্ত

লোচন দাস

৩৪ বিসিএস

বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে বুঝায়?

১১৯৯-১২৫০

১২০১-১৩৫০

১২৫০-১৩৫০

১২৫০-১৪৫০

মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম

অন্ধকার যুগ পরবর্তী মধ্যযুগের সাহিত্য কর্ম প্রধান **চারটি** ধারায় বিকশিত হয়েছে। তা হল-

- মঙ্গল কাব্য
- বৈষ্ণব সাহিত্য
- অনুবাদ সাহিত্য
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগ থেকে যা পড়তে হবে

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- মঙ্গলকাব্য
- বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী
- জীবনী সাহিত্য
- লোক সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা
- অনুবাদ সাহিত্য
- নাথ ও মর্সিয়া সাহিত্য
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
- আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য
- শায়ের, কবিওয়ালা, পুঁথি সাহিত্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য** ।

সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথি **১৯০৯** সালে **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের টিনের চালের নীচ থেকে আবিষ্কার করেন।

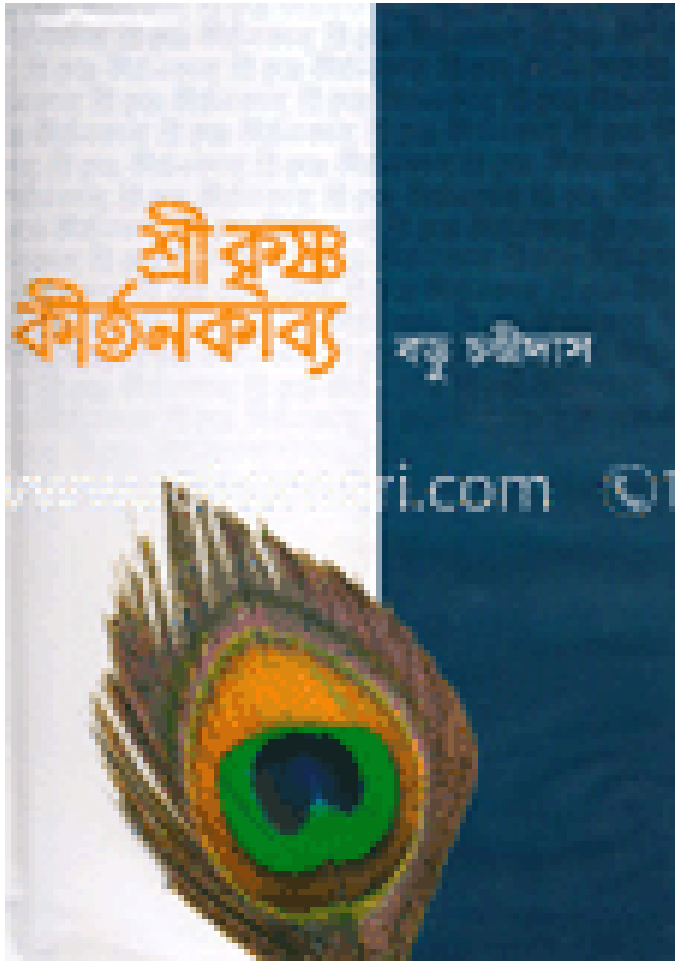

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন → ১৯০৯

১৯১৬ সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** নামে।

পুথি পরিচয়

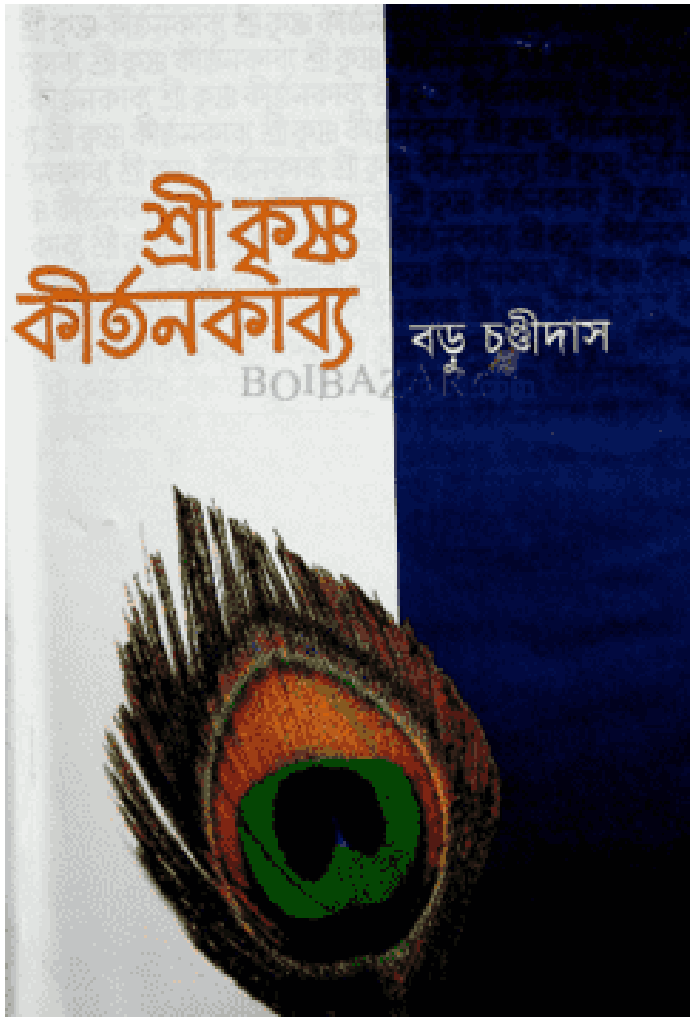

পুথিটির প্রথম দিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেও কিছু পাতা নেই।

রীতি অনুযায়ী পুথির প্রথম দিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লেখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে।

প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকালের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় পুথির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশ করেন

রাধাকৃষ্ণের ধামালী

ধামালী অর্থ রঙ্গরস, আদিরসাত্মক নাচ গান

বৃন্দাবনের গোপকিশোর নন্দসুত কৃষ্ণ সাগররাজার কন্যা ও আইহনের পত্নী কিশোরী রাধাকে বশীভূত করার চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে যে উক্তি প্রত্যুক্তি হয়, বড়ু চণ্ডীদাস তার বিবরণে লিখেছেন-'রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী।' ধামালি কথাটির অর্থ রঙ্গরস, পরিহাস বাক্য, কৌতুক। রঙ্গ তামাসার কালে কপট দম্ভ প্রকাশ করে যে সব উক্তি করা হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাকে ধামালি বলে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারোটি স্থানে ধামালী কথাটির প্রয়োগ আছে।

এই প্রেক্ষিতে কাব্যটির নাম **'রাধাকৃষ্ণের ধামালী'** হতে পারে বলে গবেষকগণ মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

পুথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব’

(অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন সন ১০৮৯

তাং ২৬ আশ্বিন

সন ১০৮৯ ✓✓

তাং ২১ আগ্রহায়ান

গুং কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব

১৬ পত্র দাখিল হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

- দীর্ঘকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত গল্পকাহিনি, পুরাণ এবং জয়দেবেরগীতগোবিন্দের সমন্বিত প্রভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচিত হয়।
- এর মূল কাহিনি ভাগবত থেকে নেয়া । রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহই এই কাব্যের মূল বিষয়। এ কাব্যের কাহিনি বাহ্যিক দিক থেকে পৌরাণিক রাধার অনুসারী, কিন্তু তা মূলত লোকজীবনকে ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে।
- রাধা-কৃষ্ণের মাধ্যমে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম এখানে ফুটে উঠেছে

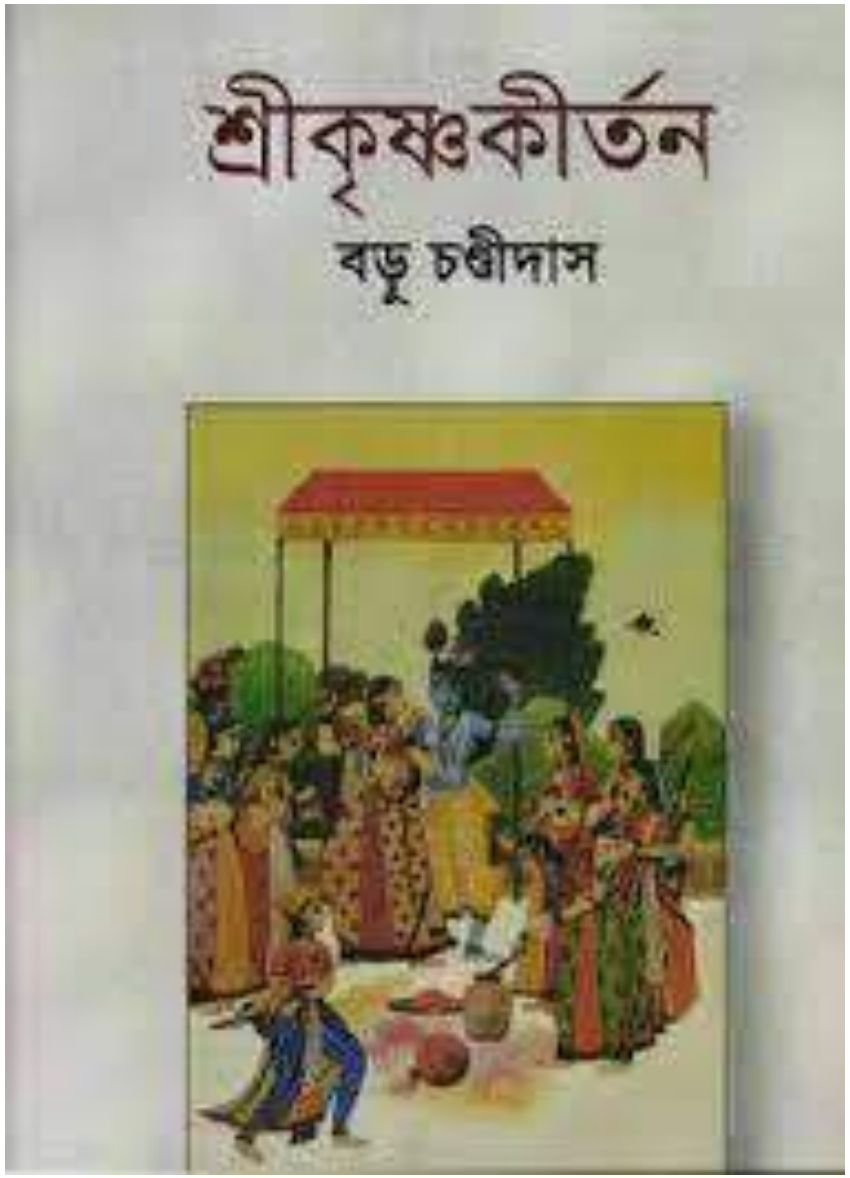

কাব্যে বড়ু চন্ডীদাসের তিনটি ভণিতা পাওয়া যায়

(ভনিতা: কবিতায় কবির নামযুক্ত উক্তি)

বড়ু চন্ডীদাস,

চন্ডীদাস

অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস আদি মধ্যযুগের প্রথম কবি।

তিনি ছাতনা, বাঁকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর প্রকৃত নাম অনন্ত, বড়ু তাঁর কৌলিন্য উপাধি, চণ্ডীদাস গুরুদত্ত নাম। প্রাক-চৈতন্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাস প্রধান কবি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

আখ্যায়িকাটি মোট ১৩ খণ্ডে বিভক্ত।

জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড ইত্যাদি ১২টি অংশ ‘খণ্ড’ নামে লেখা হলেও অন্তিম অংশটির নাম শুধুই ‘রাধাবিরহ’, এই অংশটির শেষের পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের উপজীব্য

বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়ায়ির সহযোগিতায় বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং শেষে বৃন্দাবন ও রাধা উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ।

এই হল ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের মূল উপজীব্য।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের চরিত্র

কাব্যের প্রধান **তিনটি** চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই

প্রধান চরিত্র রাধা, বাবার নাম সাগর, মা পদ্মা,

রাধার স্বামীর নাম : আইহান ঘোষ বা আয়ান ঘোষ বা অভিমন্যু ঘোষ ।

নায়ক কৃষ্ণ, পিতার নাম বাসুদেব, মাতার নাম দেবকী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

এটি মূলত **নাট্যগীতি** শ্রেণির

গঠননৈপুণ্যের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ পদই কৃষ্ণ-রাধা-বড়ায়ির সংলাপ। কোনো কোনো পদ দুজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাধা বা কৃষ্ণের একান্ত মনোভাব প্রকাশ করে । যেহেতু কথোপকথনে মনোভাবের ঘাত - প্রতিঘাত প্রকাশ পেয়েছে তাই এগুলোকে গানে রচিত নাটকীয় সংলাপ ও বলা যায়। রসগত দিক থেকে সমগ্র কাব্যজুড়ে ধামালি প্রধান হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আঙ্গিক বা গঠনগত দিক থেকে নাটগীতি ,প্রকরণে পদাবলি, রস সঞ্চালনায় ভূমিকা পালন করেছে ধামালি।

এটি **পয়ার ও ত্রিপদী** ছন্দে রচিত।

P2A

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম

এখানে রূপকের মাধ্যমে ‘রাধা’ বলতে সৃষ্টি/ভক্ত/জীবাত্মাকে এবং ‘কৃষ্ণ’ বলতে স্রষ্টা/ভগবান/ পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে।

তার মানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে **জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমকে বুঝানো হয়েছে।**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ডিত পদসহ মোট প্রাপ্ত পদ : ৪১৮টি ।

সংস্কৃত শ্লোক : ১৬১টি ।

পুঁথির পাতা : ২২৬ (দু ভাঁজ তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা) পৃষ্ঠা ছিল : ৪৫২ টি ।

প্রাপ্ত পৃষ্ঠা : ৪০৭টি।

ছন্দ : পয়ার ত্রিপদী ।

কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন : রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

কাব্যের পুঁথির লিপিকাল বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কাব্যের কাহিনিতে : রতি বা আদি রসের প্রাধান্য ।

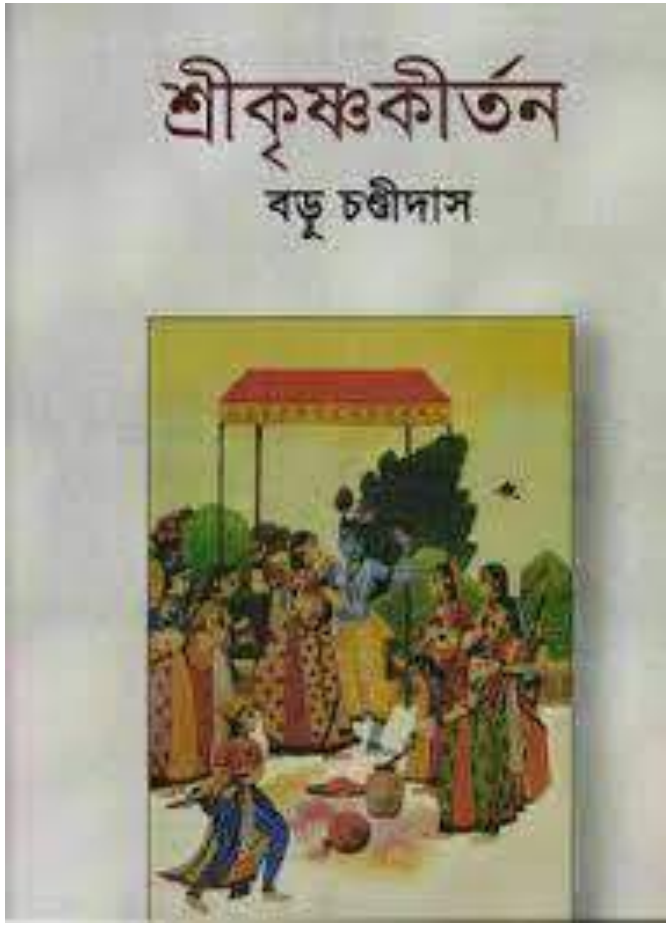

P2A

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

উ. নিম্নে খণ্ড অনুযায়ী কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

জন্ম খণ্ড : কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। জন্মের পরেই বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক দূরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের কাছে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধা আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয়। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক আইহন বা আয়ান গোপের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে রাধাকে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ড: অন্য গোপ বালিকাদের সাথে রাধা মথুরাতে দই-দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সাথে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা? রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

দান খণ্ড: কৃষ্ণ দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে। তার দাবী নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, অন্যথায় রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। রাধা নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইলো; কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচার জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ড: পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদীতীর উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ তার জীবন বাঁচিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে ডুবে মারা যেত।

ভার খণ্ড: শরৎকালে শুকনো পথঘাট, তাই হেঁটেই মথুরাকে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। আগের ঘটনাগুলো সে শাশুড়ি বা স্বামীকেও ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলেনি। রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দই-দুধ বেচে কটি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে দুধ-দই বহন করতে গিয়ে রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এসময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে তার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সে কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তাই কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু তার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত আসে।

ছত্র খণ্ড: দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, 'এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।' কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়েই কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ করেনি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ড: রাধার বিরুদ্ধ আচরণ কৃষ্ণের ভালোবাসা বাড়ায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। কৃষ্ণ কটু বাক্য না বলে, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা না করে, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলে। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়। পরে রাধার সঙ্গে তার দর্শন ও মিলন হয়।

কালিয়দমন খণ্ড: বৃন্দাবনের উপর দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। এ যমুনায় কালিয়নাগ বাস করে। কালিয়নাগের বিষে যমুনার জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ড: রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখিরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদীতীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ড: রাধা কৃষ্ণের চালাকি বুঝতে পারে। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যে বলে যাকে। কৃষ্ণ বলে, 'আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি।' বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত না হয় সেজন্য বলে যে, 'বনের কাঁটায় রাধার গজমতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।'

বাণ খণ্ড: কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ হয় মায়ের কাছে নালিশ করার জন্য। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কাতর হয় এবং কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ড: কৃষ্ণ রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাতে ঘুম আসে না। ভোর বেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাঁশি চুরি করো, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। বড়াইয়ের বুদ্ধি শুনে রাধা তাই করে। কিন্তু কৃষ্ণ বুদ্ধিমান, তাই বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। রাধা কৃষ্ণকে বলে, বড়ায়িকে সাক্ষী রেখে কৃষ্ণের কথা দিতে হবে যে, 'সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না এবং রাধাকে ত্যাগ করে যাবে না, তবেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে।' কৃষ্ণ কথা দিয়ে বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ড: তারপর কৃষ্ণ রাধার উপর উদাসীনতা প্রকাশ করে। মধুমাস সমাগত, তাই রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে বলে, কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-দই বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।' রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি হলেও তুমি আমার দিকে তাকাও।' কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি।' অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়ে পড়ে। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মথুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও।' কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না এবং রাধাকে গ্রহণ করতেও চায় না। কৃষ্ণ বলে, 'আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে।' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানেই ছিন্ন। পরবর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। তাই এ গ্রন্থের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ । যে কাব্য পাঠ করলে কল্যাণ হয় এবং সকল প্রকার অকল্যাণ দূর হয় সে কাব্যই মঙ্গলকাব্য ।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

১) মঙ্গলকাব্য এক ধরনের কাহিনি কাব্য ।

২) নায়ক-নায়িকা সবাই শাপগ্রস্ত দেব-দেবী, শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান

৩)মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেব-দেবীরা মানুষের মতো আচরণ করে

৪) মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫টি খণ্ড থাকে ।

P2A

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্য ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য। মূল উপজীব্য হলো দেবদেবীর গুণগাণ।

এ কাব্য ধারায় **নারী দেবতাদের** প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গল কাব্য প্রধানত **দু'প্রকার**। যথা- (ক) পৌরাণিক মঙ্গল কাব্য (খ) লৌকিক মঙ্গল কাব্য।

ড.দীনেশচন্দ্র সেনের মতে মঙ্গলকাব্যের **৬২** জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

মঙ্গল কাব্যের প্রধাণ ৩টি শাখা

- মনসা মঙ্গল
- চণ্ডী মঙ্গল
- অন্নদা মঙ্গল

মঙ্গল কাব্যের অপ্রধাণ ধারা

ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল ।

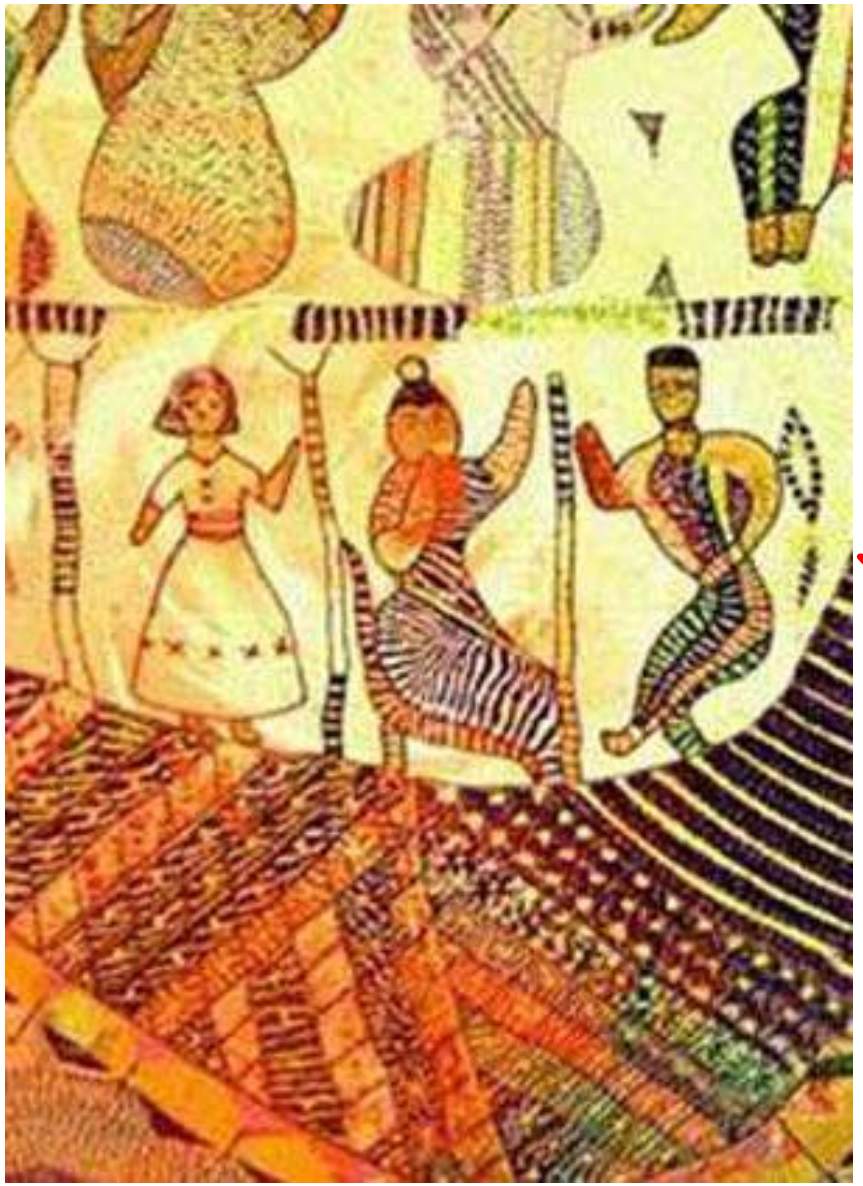

মঙ্গলকাব্য নয়

- চৈতন্যমঙ্গল
- গোবিন্দমঙ্গল

মঙ্গলকাব্য পাঁচটি অংশ

বন্দনা

আত্মপরিচয়

দেবখণ্ড

মর্তখন্ড

শ্রুতিফল

মঙ্গলকাব্য পাঁচটি অংশ

(ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা, (গ) দেবখণ্ড, (ঘ) মর্তখণ্ড বা মূল কাহিনি ও (ঙ) ফলশ্রুতি।

বন্দনা বা প্রথম অংশে প্রত্যক্ষ দেবদেবী ছাড়াও পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল দেবদেবীর নাম, সকল গুরুদের নাম বন্দনা করা হয়। দ্বিতীয়াংশে কবির আত্মপরিচয়, প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশ এবং স্থানকালের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। দেবখণ্ড অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর সমন্বয় সাধন। দেবতা শিব মঙ্গল কাব্যধারার প্রধান দেবতা।

চতুর্থ অংশে অর্থাৎ মর্ত্যখণ্ড বা নরখণ্ডে কাব্যের মূল আখ্যানভাগের শুরু। কোনো দেবতা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মানুষরূপ নিয়ে মর্ত্যে গমন এবং পরবর্তীতে মর্ত্যে সে দেবতার পূজা প্রচার- এটি মর্তখণ্ডে বর্ণিত হয়। এছাড়া এ অংশে জীবনের আনুষঙ্গিক হিসেবে বারমাস্যা, চৌতিশা, নায়িকার সাজসজ্জা, রন্ধনপ্রণালি এবং মনুষ্যসমাজের আচারআচরণ, সমাজ-সংস্কৃতি বর্ণিত হয়।

মনসামঙ্গল

সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মঙ্গল কাব্য- মনসামঙ্গল।

সাপের দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল। সমাজের নিচু শ্রেণিতে মনসা পূজার প্রচলন ঘটে। মনসা দেবীর পুজা প্রচার ও দেবী মনসার গুণকীর্তণ। এর মূল উপজীব্য

মনসামঙ্গল

মনসা সাপের দেবী, শিবের মানস কন্যা ।

মনসার অন্য নাম : কেতকা, পদ্মাবতী ।

মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-

মনসা, সনকা, নেতাই ধোপানি,

লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর

মনসামঙ্গল

মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র :

চাম্পাই নগরের বণিক চাঁদ সদাগর

মধ্যযুগের সবচেয়ে পতিপ্রাণা চরিত্র :

উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা

স্বর্গের ধোপা : নেতাই ধোপানি ।

P2A

মনসামঙ্গলের আদি কবি

কানা হরিদত্ত

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলে ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন

- বিজয় গুপ্ত –শ্রেষ্ঠ কবি (পদ্মপুরাণ)
- নারায়ন দেব (পদ্মপুরাণ)
- দ্বিজ বংশীদাস → (পদ্মপুরাণ)
- ক্ষেমানন্দ (উপাধি কেতকা দাস)– কেতকাপুরাণ
- বিপ্রদাস পিপিলাই (মনসা বিজয়)

P2A

বাইশা

বাইশা' বাইশজন কবির কবিতায় সমৃদ্ধ। মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলন করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।

এই বাইশ জন কবি হলেন

(১) বিশ্বেশর (বর্ধমান জেলার), (২) অকিঞ্চন দাস (৩) রঘুনাথ দ্বিজ (৪) রমাকান্ত (৫) জগন্নাথ বিপ্র (৬) বংশী দাস (৭) সীতাপতি (৮) রাধাকৃষ্ণ (৯) বল্লভ ঘোষ (১০) নারায়ণ দেব (১১) গোপীচন্দ্র (১২) জানকীনাথ (১৩) কমলনয়ন (১৪) যদুনাথ, (১৫) বলরাম, (১৬) হরিদাস ভট্ট, (১৭) রামনিধি, (১৮) পাণ্ডুয়া, (১৯) অনুপচান্দ ভট্ট, (২০) রামকান্ত, (২১) মহিদাস দ্বিজ, (২২) দ্বিজ হরিদাস। কিন্তু বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে এই নামের সঙ্গতি দেখা যায় না। এঁরা সকলেই হয়ত কবি নন, কেউ কেউ গায়েন রূপেও উপস্থিত।

P2A

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

- চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সদাগর। জগতপিতা শিবের মহাভক্ত। চাঁদ জগতপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভবনয়, তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। শিবভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চাঁদদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি পত্নী সনকার মনসার ঘটে হেঁতালদণ্ড দিয়ে আঘাত করেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন। চাঁদ কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্ম নেয় লখিন্দর রূপে, আর উজানী শহরে সাধুবণিকের ঘরে বেহুলারূপে ঊষা জন্ম নেয়। বহুকাল পরে সহায় সম্বলহীন চাঁদ চম্পক নগরে পাগল বেশে আসে। অবশেষে পিতা পুত্রের মিলন ঘটল।

  বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসা বৃদ্ধা বেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, 'বিভা রাতে খাইবা ভাতার'। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানানো হল। ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে পাড়ি দিল। বহু বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে নেতো ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌঁছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল। তখন দেবতাদের আদেশে মনসা সব ফিরিয়ে দিল। বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চৌদ্দ ডিঙা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে আসলো বেহুলার কাছে। এসে শুনলো যে তাকে মনসার পূজা করতে হবে। কিন্তু এ শর্ত চাঁদ প্রত্যাখান করলো। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়ল চাঁদের পায়ে এবং চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হল। চাঁদ হেলাভরে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল ছুঁড়ে দিল। মনসা এতেই খুশি। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরালে বেহুলা-লখিন্দর আবার ইন্দ্রসভায় পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পূজা।

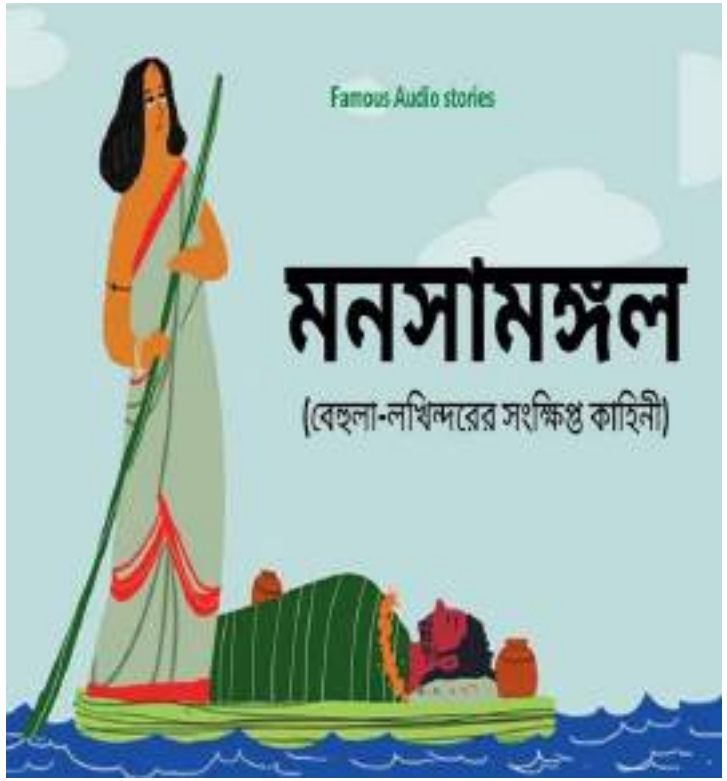

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

দেবী চণ্ডী শিবের/মহাদেবের স্ত্রী

চন্ডী দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি নিয়ে চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচিত হয়।

ষোড়শ শতকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যর সর্বাধিক প্রসার ঘটে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

চন্ডীমঙ্গল কাব্যর রচনাকাল

ষোড়শ থেকে আঠার শতক

পর্যন্ত বিস্তৃত

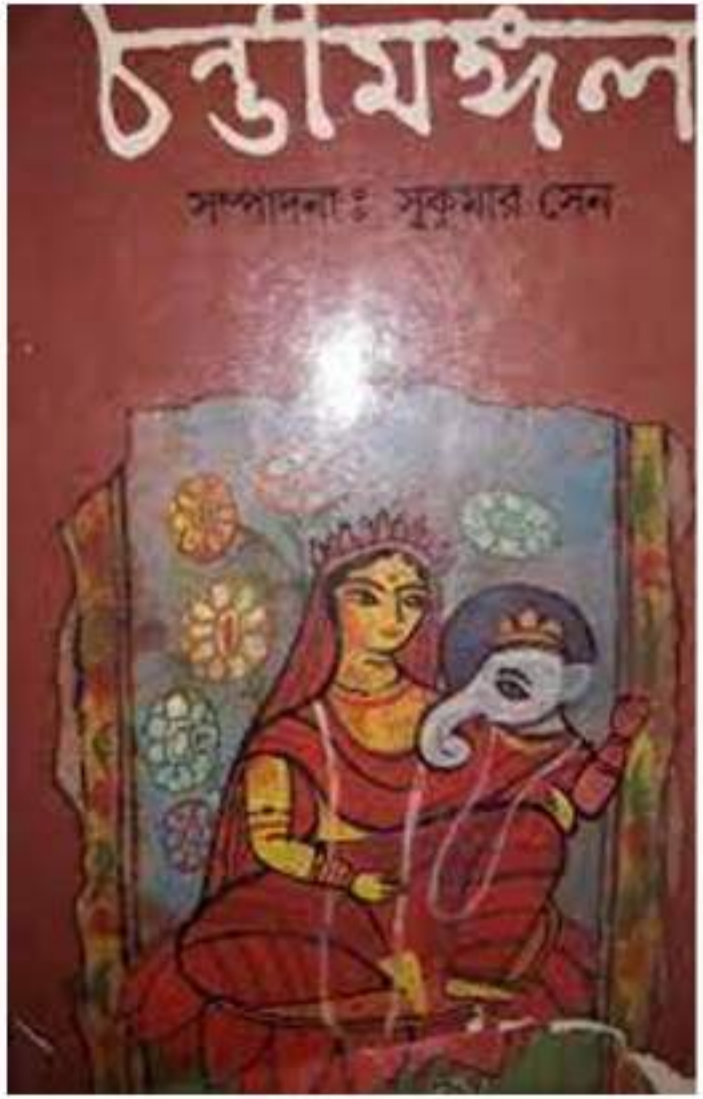

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম **মানিক দত্ত।**

চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার **সর্বশ্রেষ্ট কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী**

কবি মুকুন্দরাম জন্মগ্রহন করেন **বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে**

মুকুন্দ রামকে **'কবিকঙ্কন'** উপাধি দেন মেদিনীপুর জেলার অড়বা গ্রামের **জমিদার রঘুনাথ** চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য।

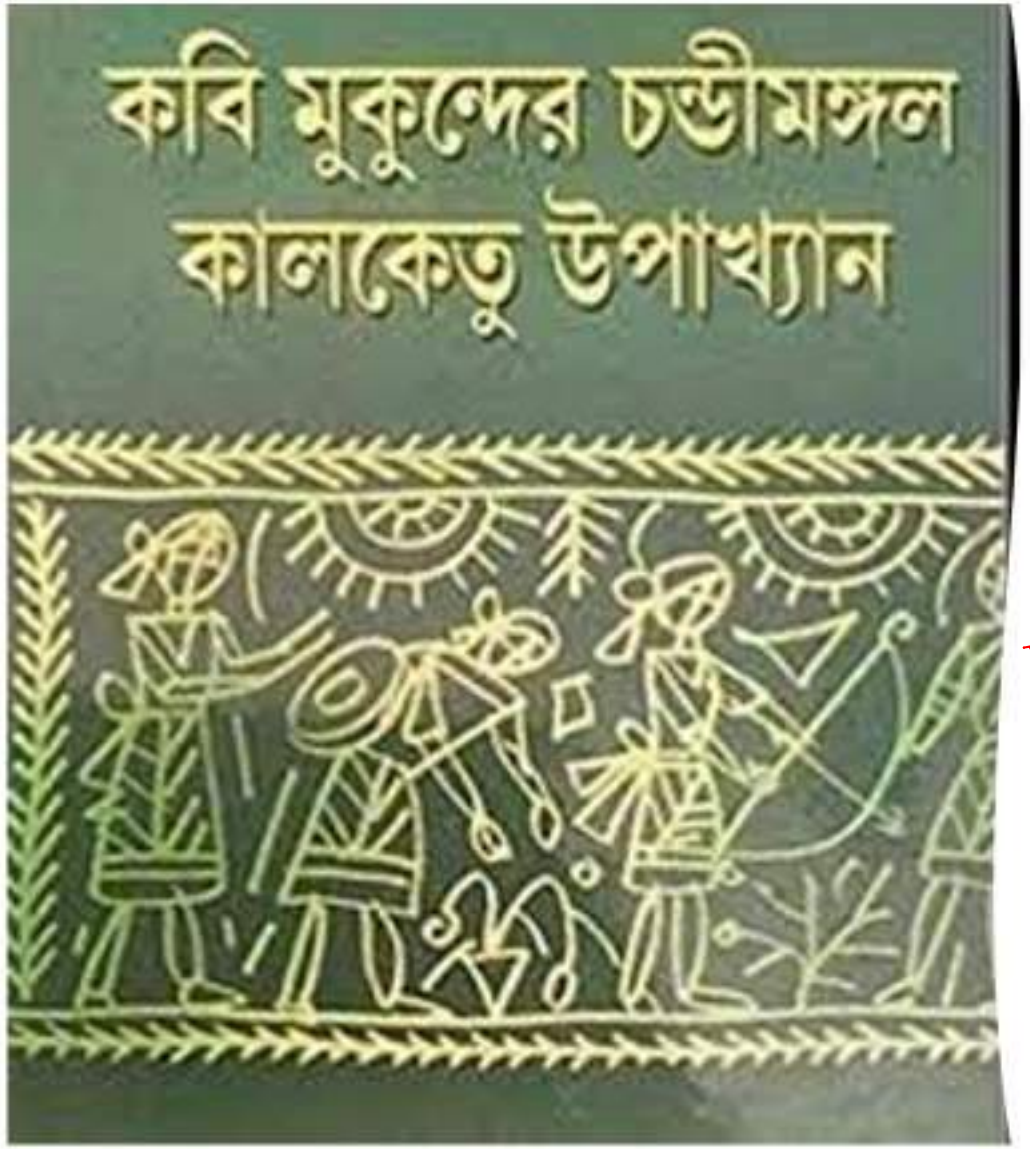

কাহিনি ও চরিত্র

চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত

১)আক্ষেটিক খণ্ড ২) বণিক খণ্ড ।

আক্ষেটিক (ব্যাধ বা শিকারী) খণ্ডের চরিত্র : কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়দত্ত, মুরারীশীল, কলিঙ্গারাজ, দাসী দুর্বলা ।

বণিক খণ্ডের চরিত্র : ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের স্ত্রী জয়াবতী

চন্ডীমঙ্গালের বিভিন্ন চরিত্র

মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র : ফুল্লরা

মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী বা খল চরিত্র : ভাঁড়ুদত্ত ।

মধ্যযুগের সবচেয়ে ঠক বা প্রতারক বা ধূর্ত চরিত্র : মুরারীশীল

চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি

- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ষোল শতকের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল' । তাঁকে দুঃখ বর্ণনার কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ জমিদার রঘুনাথ রায় 'কবিকঙ্কন' উপাধি প্রদান করেন।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যর অন্যান্য নাম

অভয়ামঙ্গল, অধিকামঙ্গল, গৌরিমঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল

প্রভৃতি।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

উল্লেখ্যযোগ্য কবির নাম

দ্বিজ রামদেব

মুক্তারাম সেন

হরিরাম, ভবানীশঙ্কর দাস

অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ

দেবীর অনুরোধে শিব তার ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠান। নীলাম্বর কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কালকেতুর যৌবনপ্রাপ্তির পর তার পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সাথে বিবাহ দেন। ব্যাধ কালকেতুর অতি দরিদ্র কিন্তু সুখী সংসার। এদিকে কালকেতুর শিকারে প্রায় নির্মূল কলিঙ্গের বনের পশুদের আবেদনে কাতর হয়ে দেবী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর শিকারে যাবার পথে প্রকট রূপ ধারণ করেন। কালকেতু শিকারে যাবার সময় অমঙ্গলজনক গোধিকা দেখার পর কোন শিকার না ক্রুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে বেঁধে পত্নীর উদ্দেশ্যে হাটে রওনা হন। হাটে ফুল্লরার সাথে দেখা হলে তাকে গোধিকার ছাল ছাড়িয়ে শিক পোড়া করতে নির্দেশ দেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরলে, দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানালেন যে, তার স্বামী ব্যাধ কালকেতু তাকে এখানে এনেছেন এবং তিনি এ গৃহেই কিছুদিন বসবাস করতে চান। দেবীকে তাড়াতে ফুল্লরা নিজের বারমাসের দুঃখকাহিনী বিবৃত করলেন, তবুও দেবী অটল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ছুটলেন হাটে, স্বামীর সন্ধানে। উভয়ে গৃহে ফেরার পর দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু ধনী হয়ে পশু শিকার ত্যাগ করলেন। বনের পশুরাও নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল । দেবীর আশীর্বাদে ধনলাভ করে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করেন। গুজরাট নগরে নবাগতদের মধ্যে ভাঁড়দত্ত নামে ছিল এক প্রতারক। প্রথমে কালকেতু তাকে বিশ্বাস করলেও প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করায় তাকে তাড়িয়ে দেন। ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গের রাজার কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গের সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করেন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি পান এবং কাল পূর্ণ হলে ফুল্লরাসহ স্বর্গে ফিরে যান।

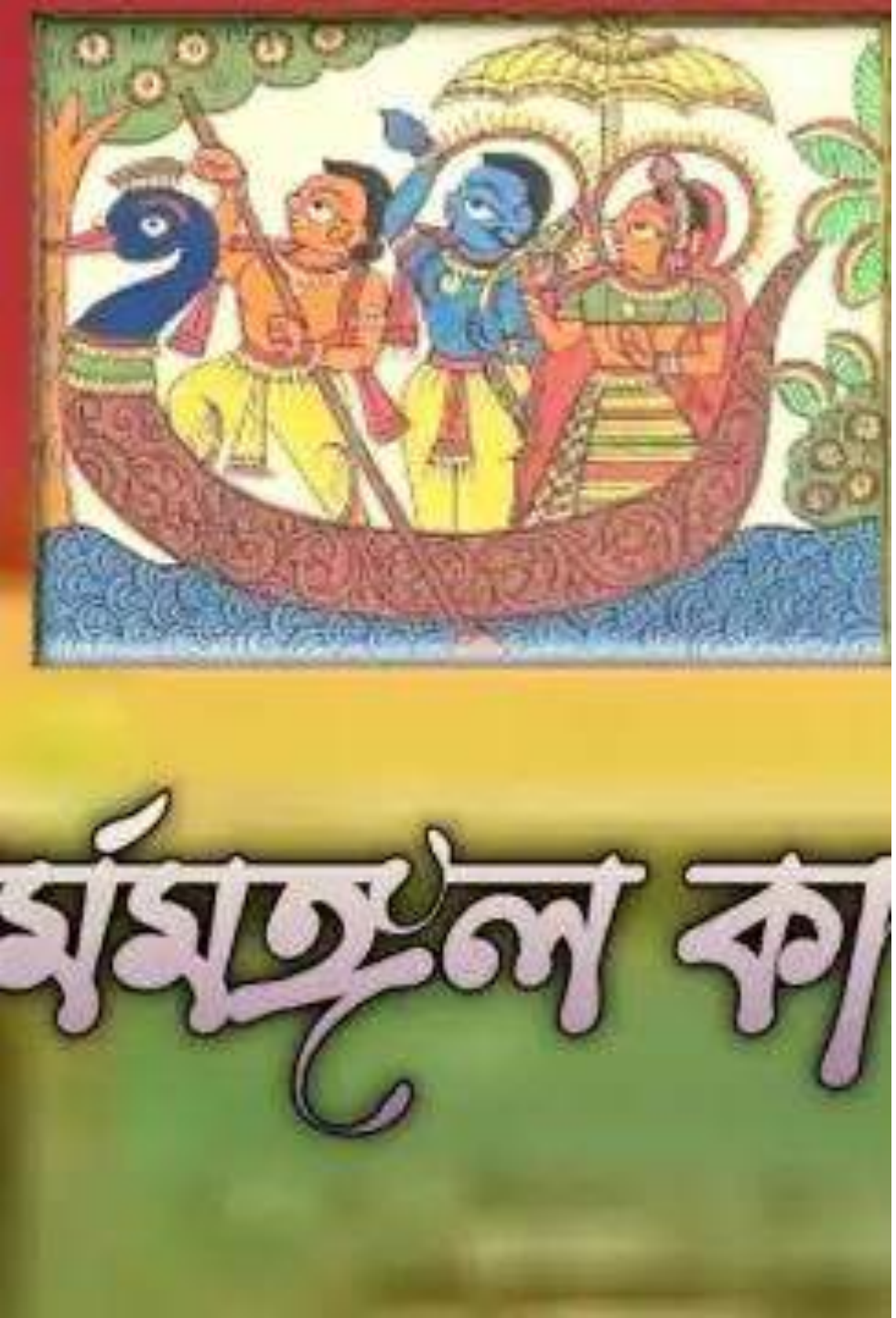

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের **কাহিনি দুটি**। যথা:

(ক) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি এবং (খ) লাউসেনের কাহিনি

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি **ময়ূর ভট্ট**।

'হাকন্দপুরান' ময়ূর ভট্ট রচিত কাব্য গ্রন্থ।

P2A

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি-

আদি রূপরাম, খেলারাম, রূপরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম, রাজারাম, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস, দ্বিজ প্রভুরাম।

ঘনরাম চক্রবর্তী (শ্রী ধর্মমঙ্গল) ধর্ম মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

P2A

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি

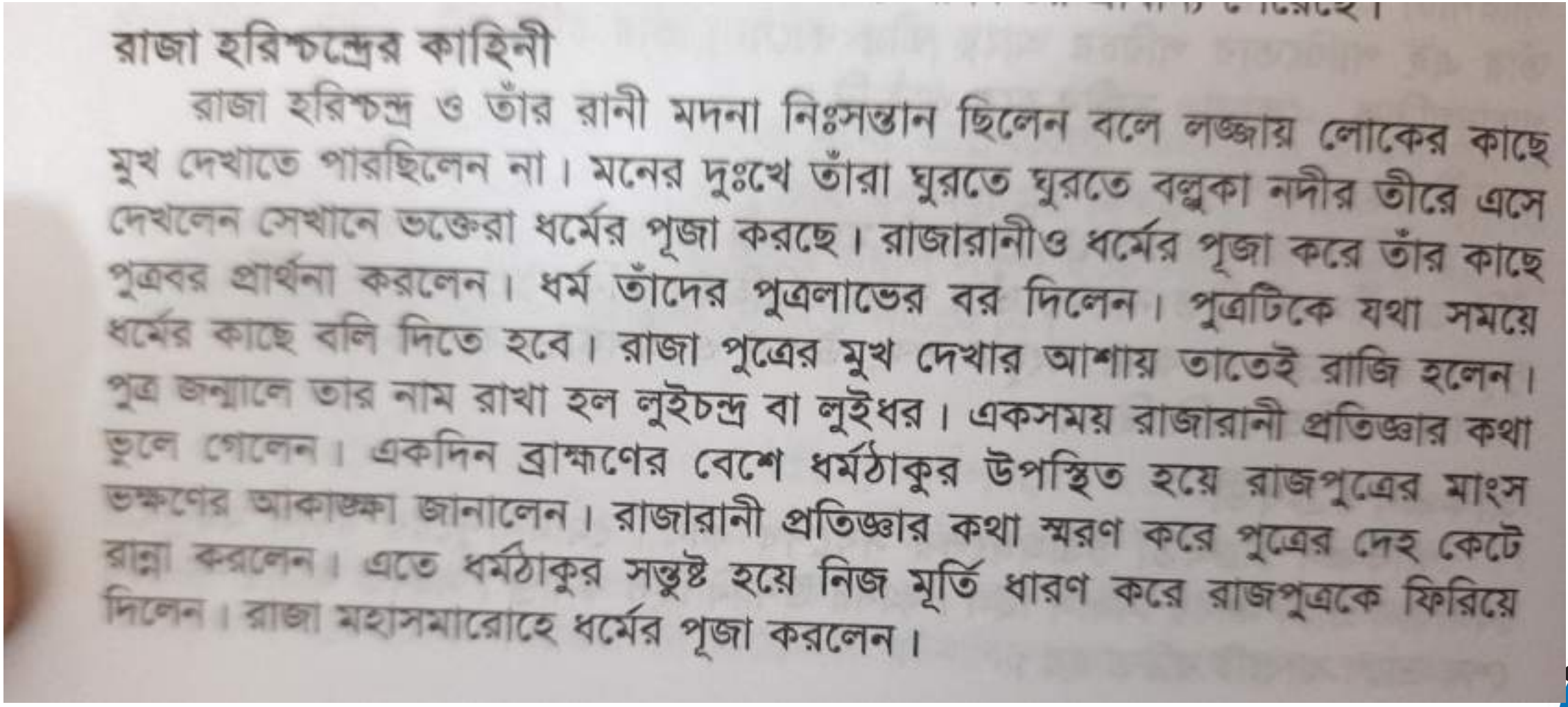

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর রানী মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। মনের দুঃখে তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে এসে দেখলেন সেখানে ভক্তেরা ধর্মের পূজা করছে। রাজারানীও ধর্মের পূজা করে তাঁর কাছে পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। ধর্ম তাঁদের পুত্রলাভের বর দিলেন। পুত্রটিকে যথা সময়ে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে। রাজা পুত্রের মুখ দেখার আশায় তাতেই রাজি হলেন। পুত্র জন্মালে তার নাম রাখা হল লুইচন্দ্র বা লুইধর। একসময় রাজারানী প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে ধর্মঠাকুর উপস্থিত হয়ে রাজপুত্রের মাংস ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জানালেন। রাজারানী প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে পুত্রের দেহ কেটে রান্না করলেন। এতে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করলেন।

লাউসেনের কাহিনি

লাউসেনের কাহিনী

গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত—নাম কর্ণসেন। ইছাই ঘোষ নামে জনৈক সামন্তের আক্রমণে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। বৃদ্ধ বয়সে সকল পুত্রের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে সংসারে আবদ্ধ রাখার জন্য নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ তা পছন্দ করে নি। সে বৃদ্ধ ভগ্নিপতি কর্ণসেনকে আঁটকুড়ে বলে উপহাস করে। রঞ্জাবতী এ গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর চেয়ে কঠোর ব্রত পালন করে। ধর্মের আশীর্বাদে এক পুত্র হল। তার নাম লাউসেন। মহামদ এ সংবাদে রাগান্বিত হয়ে ভাগ্নেকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের দয়ায় সে প্রতিবারই বেঁচে যায়। যুবক লাউসেনের বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহামদের কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর তাকে নানা দুরূহ কাজে নিয়োজিত করেন। ধর্মের আশীর্বাদে সকল কাজেই সে সাফল্য অর্জন করতে থাকে। লাউসেন প্রতিবেশী রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করে। এক সময় লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ তার রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সে লাউসেনের স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়। মহামদ গৌড়েশ্বরকে প্ররোচিত করাতে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় করানোর জন্য লাউসেন গৌড়েশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত হল। ধর্মের দয়ায় লাউসেন তাতেও সাফল্য অর্জন করল। ফলে চারদিকে তার গৌরবের কথা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ মহামদের কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর তাকে কুষ্ঠ থেকে আরোগ্য করে দিল। এ ভাবে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হয়। লাউসেনও সুখে রাজত্ব করে যথাসময়ে স্বর্গে চলে গেল।

ধর্মমঙ্গলের প্রথম অংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী খুবই পুরাতন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লাউসেনের কাহিনী অর্বাচীন। প্রথম কাহিনীটি পৌরাণিক ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অপর কাহিনীটির সঙ্গে ইতিহাস ও লৌকিক আখ্যান জড়িত হয়েছে। তবে ইতিহাসের কালের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। লাউসেনের কাহিনীই যথার্থ ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত।

অন্নদামঙ্গল

দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার।

অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা

ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।

অন্নদামঙ্গল

অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ট কবি এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সুপরিচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ভারতচন্দ্রকে **'রায় গুণাকর'** উপাধি প্রদান করেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ভারতচন্দ্র সভাকবি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।

অন্নদামঙ্গল

সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত:

(ক) শিবায়ন অন্নদামঙ্গল

(খ) বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল

(গ) মানসিংহ অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণামঙ্গল)

সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত

- ১. অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এবং ৩. মানসিংহ।
- অন্যান্য **মঙ্গলকাব্যের** মতো অন্নদামঙ্গল খণ্ডে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এই খণ্ডের প্রথমে বলা হয়েছে। এরপরে বসুন্ধর ও নলকুবেরের হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদার রূপে মর্তে আগমন , দেবীর হরিহোড়ের গৃহে প্রবেশ , এরপর দেবীর হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও ভবানন্দের গৃহে আগমন প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- ২য় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।
- ৩য় খণ্ডে মানসিংহ , ভবানন্দ মজুমদার , প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র

হীরা মালিনী

ঈশ্বরী পাটনি

ভবানন্দ, মানসিংহ, সুন্দর, বিদ্যা

অন্নদামঙ্গল

কিছু প্রবচন:

নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায়না।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।

জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী।

অন্নদামঙ্গল কিছু প্রবচন

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।

বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।

এক নজরে মঙ্গলকাব্য

কাব্যধারা	আদি কবি	শ্রেষ্ঠ কবি	চরিত্র
মনসামঙ্গল	কানাহরি দত্ত	বিজয় গুপ্ত	চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর
চণ্ডীমঙ্গল	মানিক দত্ত	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়দত্ত
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়	ভারতচন্দ্র রায়	ঈশ্বরী পাটনী
ধর্মমঙ্গল	ময়ুরভট্ট	ঘনরাম চক্রবর্তী	রাজা হরিশ্চন্দ্র, লাউসেন
শিবমঙ্গল	রামকৃষ্ণ রায়	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	
কালিকামঙ্গল	কবি কঙ্ক	রামপ্রসাদ সেন	বিদ্যা, সুন্দর

Thank you